নৈতিকতা তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে বুঝায়। আর কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল উৎস।[১০]

ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চাই মানুষকে শান্তি দিতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। ব্যারিষ্টার আবদুর রহমান বলেন, ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যের জনগণ ধর্মের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে। তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নামে একটি নতুন ধর্মের আবিষ্কার করে নিয়েছে। এ সংস্কৃতির কাজ হ'ল রাতকে দিনে পরিণত করা, নারীকে পুরুষে পরিণত করা, পুরুষকে নারীতে পরিণত করা। কলঙ্ক কালিমার পালিশের দ্বারা ঢেকে রাখা গীর্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রকে প্রমোদ কেন্দ্রে পরিণত করা, ব্যাংকের ভবন গুলোকে উপাসনালয়ের বাহ্যিক রূপদান করা ও সূদ খাওয়া। একদিকে রক্তচোষণ অন্যদিকে সাম্যবাদের শিক্ষা দান। এই আদর্শই তারা বিশ্বময় প্রচার করে বেড়াচ্ছে এবং পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষাকে প্রাচীন মধ্যযুগীয় বলে পরিত্যাগ করছে। ইট পাথরের কামরাকে সুসজ্জিত করে মনের প্রান্তরকে বিরান করে দিচ্ছে। তারা আকাশময় উড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ শান্তি ও সুখের জীবন-যাপনের রহস্য ব্যক্ত করছে না। শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ছোট-বড় সকল মানুষকে শান্তির পথ নির্দেশ যে আদর্শ, যে জীবন যে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দিতে পারে তার নাম ইসলাম, অন্য কিছু নয়।[১১]

ইতিহাস সাক্ষী সংস্কৃতি বিনষ্টের দরুন অতীতে পৃথিবী থেকে অনেক জাতির পরিচয় হারিয়ে গেছে যা কেউ কোন দিন খুঁজে পায়নি। আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে যে কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে এখনই তা প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এ জাতির স্বতন্ত্র জীবন ধারার অস্তিত্বও কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যেকোন মূল্যেই হোক সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গন থেকে অপসংস্কৃতির কুচক্রি মহলকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুস্থ ও সঠিক সংস্কৃতির সার্বিক তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে মুসলমানদের সংস্কৃতি হচ্ছে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। যা বিশ্ব মানব কল্যাণে সৃষ্টির শুরু থেকে ছিল, বর্তমানে ও আছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিরাজমান থাকবে। তাই আসুন! আর সময় ক্ষেপণ না করে আমরা ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির দিকে ফিরে আসার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করি। হে আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। যেন আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জন করে চলতে পারি। আমীন!

১০. দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে আগষ্ট, ১৯৯৭; নিবন্ধঃ অধ্যাপক মাওলানা আ ব্দুল কাসেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, ইসলামী সংস্কৃতি।

১১. ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪।

মনীষী চরিত

হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী আর নেই...। ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেখান থেকেই দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ২৩শে আগষ্ট '৯৯ সকাল ৭-১০ মিনিটে স্বগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

জন্ম ও শিক্ষা জীবনঃ

বর্তমান গাযীপুর যেলার সদর থানার অধীন শরীফপুর গ্রামে বাংলা ১৩২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ওমর খান ও দাদার নাম এলাহী বখ্শ খান। বাল্যকালে গ্রামের মক্তবে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি হয়। মক্তবেই ক্বায়েদা-আমপারা, উর্দূ পহেলী, দোসরী, তেসরী, ফারসী পহেলী, আরবী বাক্বুরাতুল আদব প্রভৃতি পড়েন। তারপর কুমিল্লার রামপুরে মাওলানা ইসমাঈল বিন মুনশী নাছীরুদ্দীন-এর মাদরাসায় গমন করেন। মাওলানা ইসমাঈল দিল্লী থেকে লেখাপড়া করে এসে এখানে মাদরাসা কায়েম করেন। উক্ত মাদরাসায় তিন বছরে 'কাফিয়া' পর্যন্ত পড়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন ও এক বছর অসুস্থ মায়ের খিদমতে থাকেন। মা একটু সুস্থ হ'লে পিতার এজাযত নিয়ে তিনি দিল্লী চলে যান। দিল্লীতে গিয়ে তিনি 'জামে আযম' ওরফে মাদরাসা রিয়াযুল উলূমে ভর্তি হন। এক বছর পর তিনি দিল্লীর বিখ্যাত 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'তে ভর্তি হন। সেখান থেকে ফারেগ হওয়ার পর পাশেই এক মসজিদে থেকে এক বছর চেষ্টার পর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে 'মৌলবী ফাযেল' (স্নাতক, আরবী স্পেশাল) ডিগ্রী হাছিল করেন।

কর্ম জীবনঃ

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি জামে আযম-এ শিক্ষকতার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তার পরের বছর একই মাদরাসায় মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী ও মাওলানা আফতাব আহমাদ রহমানী শিক্ষক হ'য়ে আসেন। কাছাকাছি দু'বছর শিক্ষকতার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন।* দেশ

** ইনি পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সভাপতি ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যান্ডের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে দু'দু'টি 'ডক্টরেট' ডিগ্রীর অধিকারী হন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিভাগে 'প্রফেসর' হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিলে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।-লেখক।*

বিভাগের গণ্ডগোলে পুনরায় দিল্লী যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি ১৯৪৬ সালে ময়মনসিংহের কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসায় সহ-সুপার পদে যোগদান করেন। ঐ সময় মাওলানা আলীমুদ্দীন (কুমিল্লা, হানাফী) সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। আট বছর সেখানে শিক্ষকতার পর সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে বর্তমান জামালপুর যেলার সরিষাবাড়ী থানার সন্নিকটে আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসায় সহ-অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় তিনি সেখান থেকে ফিরে কিছুদিন বাড়ীতে অবস্থান করেন। তারপর পার্শ্ববর্তী পিরুজালী আমানিয়া সিনিয়র মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকা মহানগরীর বংশাল মালিটোলার মদীনাতুল উলূম মাদরাসায় ১৯৮৮-৯১ এবং নাযিরা বাজার 'মাদরাসাতুল হাদীছে' ১৯৯১-৯৩ পর্যন্ত 'মুহতামিম' হিসাবে কর্মরত থাকেন।

লেখনীঃ

আজীবন শিক্ষাব্রতী এই বর্ষিয়ান আলেম শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু মূল্যবান লেখনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত বইসমূহ হলঃ (১) খুৎবার ভাষা প্রসঙ্গ (২) ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ (৩) মীলাদুন্নবী (৪) মুহাররম (৫) ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জে আকবার।

অপ্রকাশিতঃ (১) তারীখে আহলেহাদীছ (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত) (২) রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড (১-৮) ও ২য় খণ্ড (ক-জ) (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত) ১৯৯০ইং, (৩) রক্তে রঞ্জিত সমরকন্দ ও বোখারার মর্মকথা (পাণ্ডুলিপি রক্ষিত, ১ম-৫ম পর্যন্ত), (৪) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত (আধুনালুপ্ত দা'ওয়াতে মুহাম্মাদী, ১৩তম সংখ্যা পর্যন্ত), (৫) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় সক্রিয় খোদায়ী বিধান, (৬) ইসলামী সোশ্যালিজম (পাণ্ডুলিপি ১৯৭০ইং), (৭) ইসলামের সমাজনীতি (পাণ্ডুলিপি ১৯৬৬ইং), (৮) সোশ্যালিজম কর্তৃক পাকিস্তানের উপর নতুন হামলা (পাণ্ডুলিপি ১৯৭০ইং), (৯) কম্যুনিজম ও নীতি দর্শন (পাণ্ডুলিপি), (১০) সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত রাশিয়া হ'তে ধর্মের নির্বাসন (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি), (১১) সোভিয়েত রাশিয়াঃ সমরকন্দ ও বোখারার মুসলিম নিধন যজ্ঞ (পাণ্ডুলিপি), (১২) নেকীর বাগান (পাণ্ডুলিপি রক্ষিত), (১৩) নবী পরিবার ও আর্দশের মান (পাণ্ডুলিপি), (১৪) ইসলাম ধর্মে ফির্কাবন্দীর পটভূমিকা (ছোট), (১৫) সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় নীতি চরিত্রের করুণ দৃশ্য (ছোট), (১৬) সন্তান লাভের প্রাকৃতিক প্রণালী (ছোট), (১৭) মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য যরূরী), (১৮) বাহাছের শর্তাবলী (ছোট), (১৯) পবিত্র ঈদুল ফিতর প্রসঙ্গ (১০.১১.৮৫, পাণ্ডুলিপি রক্ষিত), (২০) ইসলামের দৃষ্টিতে ফাতিহা ইয়াজদহম (ছোট), (২১) স্বর্গের চাবি (মিফতাহুল জান্নাত) (ছোট), (২২) ঈমানের কষ্টি পাথর (ছোট), (২৩) জ্ঞান ভাণ্ডার বা সমস্যা সমাধান, (২৪) উর্দূ ওয়ার্ড বুক, (২৫) মহাত্মা মুসলিম (রাঃ)-এর জীবনী, (২৬) আরশ পরিচিতি (ছোট), (২৭) গণীমত পরিচিতি (ছোট) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ১৯৮৫ সালের ২৫শে অক্টোবরে নিজ গ্রামের একটি ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার একটি ক্যাসেট রয়েছে।

সন্তানাদিঃ মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু নাতি-নাতিনী রেখে যান।

জানাযাঃ

মৃত্যুর দিন ২৩শে আগষ্ট '৯৯ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটায় বাড়ীর সামনের বিরাট আঙ্গিনায় স্বীয় মেজপুত্র মাওলানা ছানাউল্লাহ্র ইমামতিতে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় প্রায় দু'হাযার ভক্ত-অনুরক্ত মুছল্লী যোগদান করেন। উপস্থিত মুছল্লীদের নিকটে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও মরহূমের কাতলাসেন আমলে ১৯৫০ সালের ছাত্র, বুখারী শরীফের একাংশের অনুবাদক বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা), আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামের আলহাজ্জ ইসমাঈল হোসায়েন নওয়াব (ঢাকা), গাযীপুর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সভাপতি মাওলানা যিল্লুল বাসেত, সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুল মান্নান, গাযীপুর পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান আ,ফ,ম, মুয্যাম্মিল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, বেলা ১১ টায় সংবাদ পাওয়ার পর রাজশাহী থেকে যথাসময়ে পৌঁছানো অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে টেলিফোন পেয়ে সম্মানিত নায়েবে আমীর উক্ত জানাযা অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন ও মরহূমের সন্তানাদিকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানীর বংশে তাঁর দাদা এলাহী বখ্শ খান প্রথম 'আহলেহাদীছ' হন। ইতিপূর্বে অত্র এলাকার সবাই হানাফী ছিল এবং তাঁর দাদা অত্রাঞ্চলের প্রসিদ্ধ 'বিবির দরগায়' পূজার নেতৃত্ব দিতেন। এই দরগাটি মা ফাতেমা (রাঃ)-এর নামে গড়ে উঠেছিল। সেখানে মানত করলে সকলের রোগ-বালাই ভাল হয়ে যাবে এবং ঐ

---

* *রাজশাহীতে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক-মুছল্লীদের বিরাট জামা'আতে লেখকের ইমামতিতে যথাসময়ে মাওলানা মরহূমের গায়েবী জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।*

দরগায় পূজা দিলে সকলের নেক মকছূদ পূর্ণ হবে, এরূপ একটি বিশ্বাস সর্বসাধারণ্যে চালু ছিল। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত নিয়ে আসেন ঢাকার বংশালের মাওলানা আবদুস সাত্তার, হাফেয মাওলানা মতীউর রহমান ও মৌলবী আবদুর রহমান প্রমুখ। মৌলবী আবদুর রহমান টাংগাইলের দেলদুয়ারের মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভারত বর্ষের ইংরেজ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন 'জিহাদ আন্দোলন'-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইংরেজের চক্রান্তে যা পরবর্তীতে 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। মোট কথা উপরোক্ত আলেমদের দাওয়াতের মাধ্যমেই অত্র অঞ্চলের লোক শিরক ও বিদ'আত হ'তে তওবা করে 'আহলেহাদীছ' হন। একই সময়ে তাঁর দাদা এলাহী বখশ খান ও আহলেহাদীছ হন।

সে সময় ঐ অঞ্চলে কোন আলেম ছিলেন না। পরে মাওলানা আবুল কাসেম রহমানী ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী দেশে ফিরে অত্র এলাকা আবাদ করেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান দেশে ফিরে প্রথমে ঐ 'বিবির দরগা' ভেঙ্গে দেন। তিনি হানাফী আলেমদের ডেকে এনে বড় আকারের জালসা করেন এবং তারা একত্রিত ভাবে কবরপূজা ও তাযিয়া পূজাকে 'শিরক' বলে ফৎওয়া দেন। প্রতি বছর মহররমের সময় উক্ত ফাতেমা বিবির দরগায় কিছু লোক ইমাম হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে 'তাযিয়া' বানিয়ে নিয়ে আসত। তিনি দরগার আশপাশের লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন এই মর্মে যে, তারা যেন তাদের জমির উপর দিয়ে 'তাযিয়া' আনতে না দেয়। ফলে 'তাযিয়া' মিছিল দরগা পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে 'তাযিয়া' বন্ধ হওয়ার পর মূল দরগাটিকেই ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৯৪৮ ইং সালের।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী একজন উঁচুদরের 'মুনাযির' ছিলেন। ঐ সময় হানাফী-আহলেহাদীছ প্রায়ই বাহাছের নামে তর্কযুদ্ধ হ'ত। তিনি প্রায় সকল বাহাছে আহলেহাদীছ পক্ষের নেতৃত্ব দিতেন। বাহাছে জিতলে দলে দলে লোক আহলেহাদীছ হ'য়ে যেত। উপস্থিত বুদ্ধিতে তৎকালীন আলেম সমাজে তাঁর জুড়ি ছিল না বলা চলে। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে মরহুমের নিকট থেকে বিরোধী পক্ষকে জব্দ করার বহু মজার কাহিনী শোনার সৌভাগ্য নাচীয় লেখকের হয়েছিল।

সাংগঠনিক জীবনঃ

১৯৪৬ সালে মাওলানা যে সময় দিল্লী থেকে দেশে ফেরেন সেই সময় মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' নাম দিয়ে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে যা 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' নাম ধারণ করে। কিন্তু মাওলানার নিজ ভাষ্য মতে 'মেযাজে ও নীতিতে না মেলার কারণে আমি কখনোই কাফী ছাহেবের সঙ্গে জমঈয়তে কাজ করতে পারিনি'। তবে তিনি সর্বদা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং মধ্যমপন্থী মেযাজের যোগ্য নেতৃত্বের তালাশে থাকতেন। ইতিমধ্যে সাংগঠনিক মতানৈক্যের ফলে জমঈয়তে আহলেহাদীস -এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, দৈনিক 'আজাদ'-এর সহকারী সম্পাদক খ্যাতনামা আলেম বংশাল জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুস্তাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯)-এর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালের ১৫ই জানুয়ারীতে 'আহলেহাদীস তাবলীগে ইসলাম' নামক ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লা ভিত্তিক পৃথক সংগঠন কায়েম হ'লে তিনি এতে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বরে মাওলানা মুস্তাছির আহমাদ রহমানীর ইন্তেকালের পরে তাঁর উপরে 'ইমারত'-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পরেও তাঁকে আজীবন আমীর-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়। ফলে আমৃত্যু তিনি এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন বলা যায়।

তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দিকঃ

(১) দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' মাদরাসায় ভর্তি হয়েই তিনি টের পেলেন বাংলাভাষীদের প্রতি উর্দূভাষীদের ঘৃণাবোধ। তারা বাঙ্গালীকে 'জঙ্গালী' বলে ঠাট্টা করত এজন্য যে, তারা উর্দূ বলতে পারত না। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে ডেকে নিয়ে মিটিং করলেন ও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা এখন থেকে মাদরাসা চত্বরে বাংলা বলব না, কেবলমাত্র উর্দূ বলব। যেমন কথা তেমন কাজ। ১৫ দিনের মধ্যেই সকল বাঙ্গালী উর্দূ বলা শুরু করল। শুধু উর্দূ ভাষায় নয়, অন্য সকল দিক দিয়েই তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদেরকে এমনভাবে যোগ্য ও সংগঠিত করে তোলেন যে, রহমানিয়ার সকল ছাত্রের উপরে বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব সহজে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

(২) দিল্লীতে গিয়ে 'জামে আযম'-য়ে ভর্তি হ'য়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বার্ষিক পরীক্ষায় পাস না করা পর্যন্ত কোথাও কিছু দেখতে যাব না। বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়ায়' ভর্তি হওয়ার পরে তিনি দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার দূর্গ দেখতে যান। যা জামে আযম-এর অতি নিকটেই অবস্থিত। লেখাপড়ার প্রতি এইরূপ যিদ ও একনিষ্ঠতা না থাকলে তিনি পরে বড় আলেম হ'তে পারতেন কি-না সন্দেহ।

(৩) ১৯৪৬ সালে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে যখন তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন, তখন

তিনি সেই মাদরাসার আরবী নাম كتلاشين -এর বদলে قَتْلَى شِيْن লেখেন। যার অর্থ 'সেনদের নিহত ব্যক্তিদের' স্থান। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, অত্যাচারী রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তার দোসরদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরের তিনটি ঘটনার মধ্যে তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় মেলে।

স্মৃতির পাতা থেকেঃ

এ দুনিয়ায় কিছু কিছু মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁদেরকে ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী অনুরূপ একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর অপত্য স্নেহের স্মৃতি আমার মনমুকুরে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসায় দু'বছরের ছাত্র জীবনে (১৯৬৭-৬৯ ইং) আমি তাঁর নিকট থেকে পুত্রস্নেহ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। বাড়ী থেকে আমার টাকা আসলে তিনি সেটা নিয়ে নিতেন আর বলতেন, 'এখানে আমিই তোমার পিতা। বাড়তি খরচ করা চলবে না। প্রয়োজন মত আমিই তোমাকে দেব'। যদিও বাড়তি খরচ করার ইচ্ছা বা সঙ্গতি কোনটাই আমার কখনো ছিল না। তাঁর লজিং বাড়ীতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত এবং আমাকে নিয়ে বিভিন্ন ইলমী আলোচনায় সময় কাটাতেন। আমার বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা ও আরবী কবিতার প্রতি তিনি দারুন আকৃষ্ট ছিলেন। বিদায় বেলায় ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আমার লেখা ৩২ লাইনের আরবী কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলী যা প্রায় কোমর সমান উঁচু কাঁচে বাঁধানো ছিল, সেটাকে তিনি আবেগের আতিশয্যে নিজেই পাঠ করে শুনান এবং শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ আড়ষ্ট হ'য়ে এলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, 'আমার জীবনের সেরা ছাত্রটিকে আজ বিদায় দিতে হচ্ছে'...। এর পরে তিনি আর কোন কথা বলতে পারেননি। উপস্থিত সবাই সেদিন না কেঁদে পারেনি।

বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন রুদ্র কঠোর। ঐ সময় আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় জনৈক উস্তাদ কুলখানি করতেন ও লাখ কলেমা পড়তেন। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু বার্ষিকী হ'ত। তাতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে ও অন্যদেরকে মহা ধুমধামের সাথে 'খানা' খাওয়ানো হ'ত। প্রতি শবেবরাতে ও ১লা বৈশাখের নববর্ষে কবর যেয়ারত করে পয়সা নেওয়া হ'ত। বছরের শেষদিকে আমি ছাত্র হ'য়ে ক্লাসে যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত উস্তাদের সাথে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। মর্যাদাবান উক্ত উস্তাদের সাথে সম্মানের সাথে দলীলভিত্তিক উক্ত বিতর্ক একটানা কয়েকদিন চলে। পাশের ক্লাসে বসা 'খান ছাহেব উস্তাদজী' তাঁর ছেলেদেরকে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'যাও গালেবের বিতর্ক শুনে এসো'। পরবর্তীতে উক্ত উস্তাদজী ঐসব ক্রিয়া-কলাপ বাদ দিলে খান ছাহেব তাঁর লজিং বাড়ীতে ডেকে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'বাপকা বেটা' যা আমরা কয়েক বছরেও পারিনি, তুমি তা কয়েকদিনেই করে ফেললে?'

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দয়া পরবশ হ'য়ে আমার থাকার জন্য মাদরাসার একটি পুরা কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন। আমি প্রতিদিন ওভালটিন আর হরলিক্স গরম করে ফ্লাস্কে ভরে 'খান ছাহেব উস্তাদজী'কে ক্লাসে গিয়ে দিয়ে আসতাম। উনি নিতে চাইতেন না। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে নিতেন ও অন্তরভরা দো'আ করতেন। বলাবাহুল্য এটুকুই ছিল আমার একান্ত কাম্য এবং বলতেকি আজও পর্যন্ত উস্তাদজীদের প্রাণখোলা দো'আই আমার একমাত্র সম্বল।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার অন্যতম বুযর্গ উস্তাদ উক্ত মাদরাসার স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মাওলানা রামাযান আলী (রহঃ)-এর কথা স্মরণ করছি। ইবনু মাজাহ-র উস্তাদ মাওলানা আবদুল গণীসহ অন্যান্য উস্তাদগণের স্নেহ-ভালবাসা ও নেক দো'আ লাভ করে ধন্য হয়েছি বটে। কিন্তু বুযর্গ উস্তাদ মাওলানা রামাযান আলীর স্নেহ স্মৃতি কখনোই ভুলবার নয়। হামীদপুর (সাতক্ষীরা), খুলনা আলিয়া ও ঢাকা আলিয়া ছেড়ে বছর শেষে গিয়ে আমি আরামনগর আলিয়াতে কামিল ১ম বর্ষে ভর্তি হই। কিন্তু লজিং কোথায়? ঐ সময় হানাফীরা আহলেহাদীছ ছাত্রদের লজিং দিত না। কোন বাড়ী খালি নেই। অবশেষে অধ্যক্ষ ছাহেব জীবনের বিগত ২২ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে বাধ্য হ'য়ে আমাকে নিয়ে গেলেন সরিষাবাড়ী বাজারের হানাফী পাট ব্যবসায়ী আবদুল হামীদ সরকারের গদিতে। পার্শ্ববর্তী সাতপোয়া পূর্বপাড়ার স্বল্পবাক সরকার ছাহেব আমাকে এক নজর দেখেই রাযী হ'য়ে গেলেন। এবারে সমস্যা হ'ল থাকব কোথায়? কেননা লজিং বাড়ীতে থাকার মেযাজ আমার কোন কালেই নেই। অবশেষে থার্ড মুহাদ্দিছ উস্তাদজী মাওলানা আবদুল গণীর পাশের ক্লাস রুমটি আমার জন্য বরাদ্দ করা হ'ল। যা আমি কখনোই আশা করিনি, প্রিন্সিপ্যাল উস্তাদজী আমার জন্য তাই-ই করলেন।

তিনি বাজারের পাশেই এক মসজিদে পাতানো বিছানায় থাকতেন। চারদিকে কেতাব পত্র ছড়ানো থাকত। অবসর সময়টা তিনি কেতাবপত্রে ডুবে থাকতেন। এ দৃশ্য দেখে বারবার আমার আব্বার কথা মনে হ'ত। কেননা তিনিও অনুরূপভাবে মসজিদে পাতানো বিছানায় বসে বই-কেতাবের মধে ডুবে থাকতেন। উস্তাদজী আমাদেরকে 'আল-ইৎক্বান' পড়াতেন। প্রায়ই ওনার মসজিদে যেতাম। আব্বার সঙ্গে ওনার পুরানো সম্পর্কের কথা স্মরণ করতেন ও আমাকে সন্তানের ন্যায় উপদেশ দিতেন। আমাকে ঢাকা থেকে আরবী-উর্দূ অভিধান 'আল-মুনজিদ' কিনে এনে দেন, যা আজও আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সঞ্চিত রয়েছে। ইতিমধ্যে আমার লজিংম্যান 'আহলেহাদীছ' হয়ে গেলে ওস্তাদজীর আনন্দ দেখে কে? তিনি বললেন, বাবা! যদি কখনো সম্ভব হয়, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের 'রওযাতুন নাদিইয়াহ' কেতাবখানা সংগ্রহ কর। আজ যখন সে কেতাব

আমার লাইব্রেরীতে, তখন তিনি আর দুনিয়াতে নেই...। তাব্লীগ-পরহেযগারীর মূর্ত প্রতীক স্বল্পভাষী এই বুযর্গ উস্তাদ সর্বদা মাথা নীচু করে দৃষ্টি অবনত রেখে চলাফেরা করতেন। ঢাকার ধামরাই থানার জেঠাইল গ্রামের এই কৃতি আলেমে দ্বীন অবসর জীবনে আমার প্রথম জীবনের শিক্ষকতার স্থল ঢাকার ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া-র অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৮২-৮৯ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৭৫ বছর বয়সে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মহাসম্মানিত স্থানে আশ্রয় প্রদান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর নছীহত অনুযায়ী সরল-সঠিক দ্বীনের পথে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসা থেকে কামেলে 'পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডে' আমার ৫ম স্থান অধিকার করার সংবাদ যেদিন 'খান ছাহেব উস্তাদজী'র কানে পৌঁছে, সেদিন তাঁর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ছিল অনন্য। কামেলে উক্ত মাদরাসা থেকে স্ট্যান্ড করার এটাই নাকি ছিল প্রথম রেকর্ড। বিদায় কালে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে সেদিন তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত আবেগময় বক্তব্য আজও যেন কানে ভাসছে। তাঁর চেহারা কেন যেন আজ বারবার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাঁর সেই সশব্দ চাপা হাসি, ছোট্ট ছোট্ট রসপূর্ণ কথা, বিলাসহীন সাধারণ জীবন, যুক্তি ও জ্ঞানে ভরা বক্তব্য সবই যেন আজ স্মৃতির সামগ্রী।

বর্তমানে নওদাপাড়া মারকাযী মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম বলেন, ১৯৯২-তে আমি যখন 'মদীনাতুল উলূম' ঢাকা-তে ছিলাম, তখন ছাত্রদের কাছে শুনেছি যে, 'ফিকহ মুহাম্মাদী' পড়াবার সময় যখনই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করতেন, তখনই তাঁর চোখ দু'টো ভিজে উঠত। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অগাধ ভক্তি তাঁকে সদা সন্ত্রস্ত রাখ্‌ত। হাদীছ বিরোধী কাজ দেখলেই তিনি রেগে উঠতেন। মসজিদের ইমামকে ছালাত শেষে প্রচলিত প্রথা মোতাবেক দলবদ্ধ ভাবে মোনাজাত করতে দেখলে তিনি ক্ষেপে যেতেন ও একাজ বাদ দিতে উপদেশ দিতেন।

আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দাও এবং দুনিয়াতে যেমন সম্মান দান করেছিলে, আখেরাতেও তেমনি সম্মান দাও। আমাদেরকেও তোমার দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও!- আমীন! ইয়া রববাল 'আ-লামীন! আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম ওয়া 'আ-ফিহিম ওয়া'ফু আনহুম! আমীন!!

[সূত্রঃ ২৬.১.৯১ ইং তারিখে ঢাকা বংশালের ১৯৮, হাবীব মার্কেট দোতলায় 'আহলেহাদীস তাবলীগে ইসলাম'-এর অফিসে নেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে, মরহুমের ছেলেদের পাঠানো বইয়ের তালিকা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে।- লেখক]

চিকিৎসা জগৎ

দরকারী এক খাদ্য উপাদান আয়োডিন

আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগের নাম 'গয়টার', যা গ্রামাঞ্চলে 'গলগণ্ড' বা 'ঘ্যাগ' নামে পরিচিত। বাংলাদেশর উত্তরাঞ্চলের যেলাগুলোতে, বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহ যেলায় 'গয়টার' রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ এ যেলাগুলো সমুদ্রোপকূল থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। এছাড়া অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে এ অঞ্চলের মাটি থেকে আয়োডিন ও অন্যান্য খনিজ ধুয়ে যায়। সমুদ্রের পানিতে সবচেয়ে বেশি আয়োডিন থাকে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শাক-সবজি, খাবার পানি এবং দুধেও আয়োডিন থাকে। উত্তরাঞ্চলের যেলাগুলোর মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকায় এসব এলাকার শাক-সবজি, খাবার পানি এবং অন্যান্য খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ খুব কম মাত্রায় থাকে।

আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে 'গলগণ্ড' বা 'ঘ্যাগ' হয়ে থাকে। 'গয়টার' আক্রান্ত রোগীদের থাইরয়েড (Thyroid) গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায়। এই ফুলে যাওয়া বা বৃহদাকার গ্ল্যান্ডগুলোকেই 'ঘ্যাগ' বলা হয়, যা দেখতে মোটেও প্রীতিকর নয়। দুঃখজনক ব্যাপার হল, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয় বেশী। গন্ডদেশে এক বা একাধিক পিন্ড ঝুলে থাকলে কেমন দেখায়, তা সহজেই অনুমেয়। 'গলগণ্ড' রোগের কারণে অনেক মেয়ের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখের অমানিশা। কেননা, এসব মেয়েকে সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। আর শুধুতো বাড়তি পিন্ড নয়, 'গলগণ্ড' রোগীদের গলার স্বরও বদলে যায়, যা মোটেও শ্রুতিমধুর নয়। এদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতেও অচলাবস্থা দেখা দেয়।

গলগণ্ড রোগীদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, (১) দৃশ্যমান (যাদের ফুলে যাওয়া গ্ল্যান্ড দেখা যায়), (২) অদৃশ্য (যাদের গ্ল্যান্ড দেখা যায় না, কিন্তু শরীরে আয়োডিনের অভাব রয়েছে)। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের গলগণ্ড রোগ রয়েছে। এদের মধ্যে দেড় কোটি লোকের গলগণ্ড দৃশ্যমান। বাকি চার কোটি লোকের গলগণ্ড রয়েছে, কিন্তু দেখা যায় না। জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ১০.৫১ ভাগ লোকের গলগণ্ড দেখা যায় এবং শতকরা ৩৬ ভাগ আয়োডিনের অভাব জনিত সমস্যায় ভুগছে।